সেকালের কোলকাতার সমাজ জীবন

অশোককুমার রায়

নকশা - প্রহসন - নাটক - উপন্যাসে

এ্যাডলফ্ হিটলার তাঁর আত্মজীবনী 'মাইন কাম্ফ' গ্রন্থে লিখেছিলেন, "I can fight only for what I love, love only what I respect and respect only what I at any rate, know about" ---অর্থাৎ সোজা বাংলায় বলা যায়, "আমি কেবল তারই জন্যে লড়তে পারি, যাকে আমি ভালবাসি, কেবল তাকেই ভালবাসি, যাকে শ্রদ্ধা করি এবং তাকেই শ্রদ্ধা করি, যার বিষয় আমি অন্তত কিছু জানি।"

হিটলারের এই উক্তি খুবই প্রণিধানযোগ্য। আমরা যে দেশে বা শহরে জন্মেছি কিম্বা বাস করছি, সেই দেশ বা শহরের প্রতি (শত ত্রুটি থাকলেও) একটা ভালবাসা তথা একটা অদৃশ্য টান অনুভব করা স্বাভাবিক। অবচেতন মনের এই মায়া বা টান যাই বলি না কেন, দেখা দেয় চেতন মনে - জিজ্ঞাসা হয়ে। খোঁজ পড়ে যায়, ওটা কি, কেন, কবে থেকে? অশেষ ভাগ্য, আমাদের এই শহর কলকাতার জীবন - ইতিহাস নানাভাবে গ্রন্থবদ্ধ হয়েছিল অসংখ্য গ্রন্থে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই। সেই গ্রন্থ স্রোত আজও অব্যাহত থেকে প্রমাণ করেছে আমাদের ভালবাসা আমাদের কৌতুহল তথা জিজ্ঞাসা। কলকাতা বিষয়ক শত শত গ্রন্থের মধ্যে নকশা, প্রহসন, নাটক, উপন্যাসের সংখ্যাও কম নয়। তবে সমাজ চিত্র যথার্থ ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এমন গ্রন্থের সংখ্যা সব কালেই সীমাবদ্ধ মনে করা যায়। যেমন কালীপ্রসন্ন সিংহের "হুতোম প্যাঁচার নকশা'ই বাঙলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক নকশা। গ্রন্থটির 'রচনা পদ্ধতি' নিয়ে বলতে গেলে অল্প কথায় বলা যায় এতে মোট তিন ধরনের রচনা আছে। বলা বাহুল্য এই তিন ধরনের রচনাই নকশা রূপে নির্দিষ্ট হতে পারে। বাংলা নকশা-প্রহসন - নাটক ও উপন্যাসের জন্ম যেমন হয় কলকাতায়; তেমনি প্রথম যুগের সব রচনাতেই কলকাতা ও তার দেশীয় - ইংরেজ সমাজ, তথা উন্নয়ন - কুসংস্কার - মূল্যবোধের চিত্রগুলি মূর্ত হয়ে উঠেছিল-- যা' আজ সেকালের কলকাতার এক ঐতিহাসিক দলিলে পরিণত হয়েছে।

সেদিনের সেই অজস্র রচনার একটি বড় অংশই যদিও আজ অশ্লীলতা ও দুর্বল ভাষার শিকার বলে বিবেচিত তবু উল্লেখ করা যেতে পারে এমন নকশা, প্রহসন, নাটক, উপন্যাসের সংখ্যাও কম নয়। এগুলিতে সেদিনের কলকাতা এমন জীবন্ত রূপে উপস্থিত, যা ঐতিহাসিকের তথ্য নিপণের সময় একেবারেই অবহেলিত সুনির্দিষ্ট কারণেই।

সেকালের কলকাতার জীবন ও তার মনোজগৎকে জানতে হলে পড়তে হবে তাই সর্বাগ্রে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬১)। তারপর ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাস' (১৮২১), 'নববিবি বিলাস' (১৮২২), 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩) ঝিনাথ মিত্রের 'কলিরাজার মাহাত্ম্য' (১৮৫০), নারায়ণ চট্টরাজের 'কলি কুতুহল' (১৮৫৩) কলি কৌতুক (১৮৫৮), রামনারায়ণ তর্করত্নের'কুলীন কুল সর্বস্ব' (১৮৫৪), রামধন রায়ের কলিচরিত (১৮৫৫), মধুসূদন দত্তের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০), 'একেই কিবলে সভ্যতা' (১৮৬০) হরিশচন্দ্র মিত্রের 'ম্যাও ধরবে কে' (১৮৬২), 'ঘর থাকতে বাবুই ভেজে' (১৮৬৩), ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের'আপনার মুখ আপনি দেখ' (১৮৬৩), ক্ষেত্রমোহন ঘোষের 'কাক ভূষুণ্ডীর কাহিনী' (১৮৬৫), ভুবন চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'সমাজ কুচিত্র' (১৮৬৫), দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬), 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬), নীলদর্পণ' (১৮৬০), রাম সর্বস্ব বিদ্যাভূষনের 'আসমানের নকশা' (১৮৬৮), হীরালাল মুখোপাধ্যায়ের 'কলকাতার হাটহদ্দ' (১৮৬৯), ভাঁড় সঙ্কলিত 'সচিত্র গুলজার নগর' (১৮৭১), দুর্গাচরণ রায়ের 'দেবতাদের মর্ত্যে আগমন' (১৮৭৩), ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কল্পত' (১৮৭৪), 'ভারত উদ্ধার' (১৮৭৮)শিশিরকুমার ঘোষের 'নয়শো রূপেয়া' (১৮৭৩), 'বাজারের লড়াই'

(১৮৭৪), হরনাথ ভঞ্জের 'সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়' (১৮৭৫), বটকৃষ্ণ রায়ের 'বাসর কৌতুক' (১৮৭০), অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমাজ রহস্য' (১৮৭৭), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টাপাধ্যায়ের 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত' (১৮৮৪), যোগেন্দ্র চন্দ্র বসুর 'বাঙালী চরিত' (১৮৮৫), 'মডেল ভগিনী' (১৮৮৬), দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'এক ঘরে' (১৮৮৯), রাজকৃষ্ণ রায়ের 'টাটকা টোটকা' (প্রহসন ১৮৯০), 'জগা পাগলা' (প্রাহসনিক নাট্যরঙ্গ ১৮৯০), 'লোভেন্দ্র - গবেন্দ্র' (নাটক ১৮৯০), অমৃতলাল বসুর 'তবালা' (১৮৯১) 'বাবু' (১৮৯৪), 'সাবাস বাঙালী' (১৯০৪), 'খাস দখল (১৯২২), গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বড়দিনের বখশিস্' (১৮৯৩), 'সভ্যতার পাণ্ডা' (১৮৯৪), 'বেল্লিক বাজার' (১৮৯৬), 'বড়দিনের পঞ্চরঙ' (১৮৯৬), অবতার চন্দ্র লাহার 'আনন্দ লহরী বিকল্পে সমাজ সংস্কার' (১৮৯৬), গোবিন্দ চন্দ্র দের 'কলকাতা' (নকশা ১৮৯৭), হরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা রহস্য' (১৮৯৭), ধীরেন্দ্রনাথ পালের 'মানিক' (১৮৯৯) প্রভৃতি নকশা - নাটক - প্রহসন - উপন্যাস। এইসব নকশা, প্রহসন, নাটক ও উপন্যাসে কলকাতার সমাজ সংস্কৃতির নানা ঘটনা বহুল চিত্রাবলী অত্যন্ত ঝিস্তভাবে অঙ্কিত হয়েছে। তাই তিনশো বছরের কলকাতার সমাজেতিহাস জানতে জিজ্ঞাসু পাঠক, লেখক ও গবেষকদের কাছে এই গ্রন্থগুলি বিশেষ গুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে বলে আমাদের ঝিাস।

এই সব নকশায় সেকালের দৃষ্টিতে সেকালের নব্যযুগ, সেকালের নব্যযুগে সেকালের পুরাতনের বিদায় যেভাবে চিত্রিত করেছেন তাতে যথেষ্ট একালীন মনোভাবের পরিচয় বহন করে।

লেখকদের স্বদেশের প্রতি গভীর আন্তরিকতা, দেশীয় সমাজের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ও স্বভাবের বিকৃতিতে প্রকৃত ঘৃণা তাঁদের গ্রন্থগুলি রচনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। একদা যে কলকাতায় লোকে টাকা খোলমকুচির মত ব্যবহার করেছে, স্ফুর্তির ফোয়ারা উড়িয়েছে, প্রচলিত নিয়মে মদ ও বাইজী নিয়ে হুল্লোড় করেছে, বুজকিয়ানায় যে শহর সব শহরের সেরা সেই শহরের নিখুঁত ছবি এঁকেছেন এইসব নিপুণ লেখক চিত্রকরেরা। নিজেদের দেশ বা সমাজের অতীত রূপ সম্পর্কে যাঁদের দৃষ্টি মোহচ্ছন্ন, অতীত মানেই যাঁদের ধারণা 'রাম রাজত্ব' তাঁদের কাছে অনুরোধ, একবার এইসব গ্রন্থগুলি পড়ে দেখুন, সততা, পুষকার, শ্রদ্ধা, দেশপ্রেম, সমাজ চিন্তা যে ছিল না তাও যেমন নয়, তেমনি যে কদর্য স্থুল রেষারেষি, কুসংস্কারে বদ্ধ মন, অহংকার - নিষ্ঠুরতা জাতের তথা ধর্মের নামে বজ্জাতির প্রাদুর্ভাবে -- কলকাতা তার সেই যৌবন দিনেই কতখানি কলঙ্কিত হয়েছিল তা আমরা এখানে উল্লেখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে থেকে সরাসরি ভাবেই পাই। কষ্টি পাথরের যাচাই করে সে যুগের যা কিছু সোনা আর যে টুকু খাদ সেটুকু খুঁজে বার করবার গভীর দৃষ্টি প্রায় সব লেখকেরই ছিল। ঐতিহাসিকের যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকে, তা এই সমাজহিতৈষী কাহিনীকার -- নাট্যকারদের মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। সমাজের ভালমন্দকে সামনে নিয়ে এসে দেখানো --- সেকালের কলকাতায় যা ছিল অহরহ তা হল হঠাৎ আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ মস্ত লোক পদ্মলোচনের দল, হীন মনোবৃত্তি সম্পন্ন মোসাহেব সম্প্রদায়, নানা রকমের অর্থহীন হুজুগপ্রিয় মানুষ, নিন্দুকে সাধারণ বাঙালী সমাজ, হৃদয়হীন ব্রিটিশ ব্যবসায়ী - কর্মচারী, প্রচলিত গ্রাম্য কু - প্রথা সকল --- কিছুই বাদ যায়নি সেদিনের এই সব নকশা, প্রহসন, নাটক উপন্যাসে। কালীপ্রসন্নের হুতোম প্যাঁচার নকশায় চড়ক পূজা বারোয়ারী পূজা, রথযাত্রা ইত্যাদির যা বর্ণনা দিয়েছেন, তা যেমন সজীব, সত্য, তেমনি অন্তর্ভেদী। পূজার দেবতা গিয়েছিলেন হারিয়ে --- তাই মাতাল রথকে প্রণাম জানিয়ে গায় -- 'কে মা রথ এলি? খালি বাবুয়ানি, বেলাল্লাপনাই সার হয়েছিল শহরের বড় মানুষদের। কালীপ্রসন্ন সমালোচক, নিন্দুক নন। তিনি এই সব ধনী ও সমাজপতিদের কাছ থেকে সমাজের মঙ্গল আশা করেছিলেন, তাই এঁদের হীনমন্যতা তাঁকে পীড়িত করেছিল ও "হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় সেদিনের বাস্তব চিত্র এঁকেছিলেন -- যার বেশীর ভাগ কথাই অলিখিত থেকেছে সেকালের ঐতিহাসিকদের লেখায়।

দ্বিতীয়বারের প্রকাশনার সময় গৌর চন্দ্রিকায় কালীপ্রসন্ন লিখেছেন, "যেগুলো হতভাগা, হুতোমের লক্ষ্য, লক্ষীর বরপুত্র, পাজীর টেক্কা ও বজ্জাতের বাদ্শা, তারা -- বলে, 'দেখি হুতোম আমায় গাল দিয়েছে কিনা? কিম্বা কি গাল দিয়েছে বলেও অন্তত লুকিয়ে পড়েছে। শুধু পড়া কি, অনেকে শুধরেচেন। সমাজের উন্নতি হয়েছে ও প্রকাশ্য বেলেল্লাগিরি বদমাইশি ও বজ্জাতির অনেক লাঘব হয়েছে।"

ঊনিশ শতকে কলকাতার সমাজ জীবনে বিশেষ করে অভিজাত ঘরে সততার অভাব, দুর্নীতির প্রভাব, স্বার্থপরতার চরম

ও হীন চির মাত্রাধিক্য যতখানি ঘটেছিল তা শুধু হুতোমকেই নয়, মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো', ঠাকুর দাস মুখোপাধ্যায়ের 'সহর চিত্র' এবং গিরিশচন্দ্রের 'বেল্লিক বাজার' ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে এক সুস্পষ্ট সমাজ ইতিহাস রচনা করেছে।

খ্যামটা নাটের ও বাই নাচের আসরে ছেলে বুড়ো একসঙ্গে বসতে পারে না, তবু বসেছে। কবি গাওনায় ও গানের সঙ্গে চলেছে অশ্লীল কথার বন্যা; মাতাল হয়ে ছেলে ইয়ার বক্সীদের নিয়ে নিজের জন্মদাদার গায়ে হাত তুলেছে। বড়লোক - দুশ্চরিত্রদের জ্বালায় ঘরে দরজা দিয়েও নিশ্চিন্ত হওয়ার উপায় ছিল না ঘরের মেয়ে বৌদের। ভাবতে অবাক লাগলেও এই শহর কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজের অধিকাংশ মানুষই প্রকৃত ধর্ম কি তা ভুলে গিয়ে ধর্মের ভাঁওতায় ভুলে সাজা সন্ন্যাসী, মন্ত্র, তুকতাক, মাদুলী নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। এসবের বিদ্ধে সেদিন কিন্তু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ব্যঙ্গ - বিদ্রুপের কষাঘাতে জর্জরিত করে তোলেন ভণ্ড ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন নির্দয় স্বার্থপর মানুষগুলোকে তাঁদের রচিত সাহিত্যে।

ছেলে ধরার হুজুক, মৃত ব্যক্তির স্থলে নকল মানুষ সেজে আসা, কোন সামান্য ঘটনা নিয়ে নানাভাবে বিকৃত রটনা, কিছুই এই সব লেখকদের দৃষ্টি এড়য়নি।

আসলে সাধারণ মানুষ এ সময় ছিল নিতান্ত মেদণ্ডহীন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও পরান্ন প্রিয়। আত্মীয় - পড়শী - পরিচিতজনের উন্নতি ছিল তাদের দু চোখের বালি, কায়স্থ ধনীর বাড়ি পাত চেটে এসে সেদিনের তথাকথিত ব্রাহ্মণ - সমাজের মাঝে দাঁড়িয়ে 'হলপ' করে জানাত নিমন্ত্রণের দিন তারা নিতান্তই অসুস্থ ছিল। বলা চলে, বড়লোকের খোসামুদিতে এরা ছিল সিদ্ধহস্ত। ধর্মের নামে গু সম্প্রদায় এই পৌষহীন সমাজে চালিয়ে ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ের ব্যাভিচার। শ্বশুর বাড়ি যাবার আগে কন্যাকে গুপ্রসাদী হতে হতো এই কলকাতায়! এইসব গুর আশে পাশে ঠিক এখনকার মতই নবীনা - প্রবীণার ভীড় জমে উঠতো। অনেক ক্ষেত্রেই যার ফলে সৌরভ সারা শহরে ছড়িয়ে পড়তে দেরী হত না।

যাইহোক ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতার উচচ - মধ্য ও নিম্ন বিত্তের এই যে ব্যঙ্গময় চিত্ররূপ উদ্ধৃত গ্রন্থগুলিতে ফুটে উঠেছে- তা রসিক চিত্তের উপভোগ্যতাতেই সীমাবদ্ধ নয় -- তথ্যানুসন্ধানী ইতিহাস পাঠক ও গবেষকের কাছে বিশেষ মূল্যবান বলে মনে করি।এত সজীব ও নিখুঁত অতীতের ছবি ইতিহাসের 'আকর গ্রন্থ' বলে বিবেচিত গ্রন্থেও পাওয়া যাবে না। সেকালের 'সাহিত্য' হিসেবেও গ্রন্থগুলির মূল্য আছে -- চলিত বাংলার সূত্রপাত তথা প্রচলন এই গ্রন্থগুলির মধ্যে দিয়ে হয়েছিল বলা চলে। আত্মবিস্মৃত জাতির অতীত ঠিক কতখানি গৌরবের ও কতখানি অগৌরবের তার বিচারও বিশ্লেষণের দিন আজ। সেদিনের 'ভালর অংশ' আজ আমাদের এই সামগ্রিক অবক্ষয়ের দিনে নিশ্চয়ই গ্রহণ করতে হবে। সেই হবে আমাদের উত্তরাধিকার। আর সে দিনের সেই সব লজ্জাজনক উপাখ্যান পড়ে আমাদের শুধু ধিক্কার দিলে হবে না, সেই লজ্জাকর ঘটনার পুনরাবৃত্তি খতে হবে। তবে সব শেষে একটি কথা মনে রাখতে হবে উনিশ শতকেই এর শহর কলকাতায় ভারতীয় নব জাগরণ মূর্ত হয় - অন্ধকার কেটে আলোর বন্যা নামে।